- 9 JAN 2017

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন

সমকালীন প্রসঙ্গ

মমতাজ লতিফ
শিক্ষাবিদ

প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন আগেই যথার্থ বলেছেন, শিক্ষা ছাড়া নারী, পুরুষ, কারও যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা বলতে আমরা অবশ্যই মানসম্মত শিক্ষা বুঝি। ধরা যাক, ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন ১০০ নম্বরে ৮০ ও এর ওপরে, ৪০ জন ৫০-৬০, ৩০ জন ৩০-৪০, বাকি ২০ জন ১০-২০ নম্বর পেয়েছে। এরাই শিক্ষার যথাক্রমে উচ্চমান, মধ্যমমান, নিম্নমান ও মানহীন স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষায় কিন্তু প্রথম তিন মানের শিক্ষার্থীরাই উত্তীর্ণ হয়, অনুত্তীর্ণ থাকে সর্বনিম্নের মানহীন স্তরের শিক্ষার্থী। অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়বস্তুর সব দক্ষতার ৯০ শতাংশ অর্জন করে উচ্চমানের ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী, অন্যরা ৫০-৬০ শতাংশ, ৩০-৪০ শতাংশ দক্ষতা অর্জন করে উত্তীর্ণ হয়। মানসম্মত শিক্ষার্থী কমপক্ষে দক্ষতার ৮০-৯০ শতাংশ অর্জন করবে, তাই নয় কি? সুতরাং মধ্যমমান, নিম্নমানের শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয়ের অর্ধেক এবং সর্বনিম্নের শিক্ষার্থী ১০-২০ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ বিষয়ে এডুকেশন ওয়াচ ছাড়াও আমার নিজস্ব গবেষণা আছে, যাতে দেখা গেছে– সব বিষয়ে মানসম্মত (ওপরের ২ স্তর) নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব কম, যদিও নমনীয় প্রমোশন নীতির ফলে ৩০-এর নিচে নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীরাও পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। একটি সর্বজনীন সত্য, পুরো দুনিয়ার সব দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা সব দেশের সব শ্রেণিতে কমই থাকে, যাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে দক্ষ বিজ্ঞানী, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনবিদ, শিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ। অর্থাৎ এরা সবাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে মৌলিক শিক্ষার প্রথম ভিত ভাষা ও গণিতের সব দক্ষতা-যোগ্যতাগুলো পুরোপুরি অর্জন করেছে, যার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ তাদের জন্য সহজ হয়েছে। সুতরাং ভাষা ও গণিতের মৌলিক দক্ষতা অপর ৮০-৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীকেও অর্জন করতে হবে। তাহলেই মানবসম্পদ তৈরি সহজ হবে।

আমরা জানি, ভাষা (বাংলা, ইংরেজি) হচ্ছে অন্য সব বিষয় যেমন– বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, এমনকি গণিত শিক্ষারও প্রধান বাহন বা ভিত! একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব, গণিতের একটি অঙ্ক বা সমস্যা বা পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব বা সূত্র বা চিকিৎসাবিদ্যার কঠিন, অধিকাংশের কাছে নীরস বিষয়ও আমরা সহজে শুদ্ধভাবে বুঝতে পারি, যখন আমাদের বাংলা ও ইংরেজির ভাষা দক্ষতার মান হয় খুব ভালো। সে জন্য, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ভাষা শিক্ষার মান বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এর আগে শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিশুশিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক রচনা ইত্যাদিতে পেশাগতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক কলামে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা, পরামর্শ প্রদান করেছি, যা সরকারের কেউ শুনেছে– এমন দেখিনি। তবু দেশটা আমাদের, শিশুরা একদিন আমাদের ভবিষ্যতের নেতা, নেত্রী এবং তারাই সব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ হয়ে হাল ধরবে এ দেশের। সুতরাং শিশুদের বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব আছে বলে বিশ্বাস করি। একটি কথা স্বীকার করতেই হবে, শিক্ষার প্রথম দুটি স্তরে উচ্চতম মানসম্পন্নদের সংখ্যা খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব না হলেও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থমানের শিশুদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আরও নানা ক্ষেত্রে মেধা বিকাশের জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে– যেমন গণিত অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, নদী অলিম্পিয়াড হচ্ছে, তেমনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষার অলিম্পিয়াডও আয়োজন করা যেতে পারে।

এখন আমাদের শিশুদের টার্মিনাল পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। কেননা তা বড়দের ইচ্ছায় পরিকল্পিত হয়েছে, যারা শিশুদের শিখন প্রক্রিয়া, শিখন অন্তরায় সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নন।

আমরা এনসিটিবির শিক্ষাক্রম শাখায় এক সময় একটি প্রকল্পের সাহায্যে সব প্রাথমিক স্কুলে 'প্রস্তুতি ও নিরাময়মূলক শিক্ষা'র অবদান অনেক বেশি হয়ে থাকে, যার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ও সময় ব্যয় দরকার হয় না। শিশুদের বিশেষত যাদের বাবা-মা নিরক্ষর, দরিদ্র অথবা অল্প শিক্ষিত, তাদের ভাষা ও গণিতের দক্ষতাগুলো ভালোভাবে শেখা হয় না বলে তাদের মধ্যে 'শিখন ঘাটতি' বা 'শিখন দুর্বলতা' থেকেই যায়। সেই ঘাটতি বা দুর্বলতা কাটিয়ে তোলাকেই 'নিরাময়মূলক শিক্ষা' বলে যা বিদেশে সব স্কুলে চালু দেখেছি। শিশুদের জন্য ঘাটতি পূরণ না করা পর্যন্ত তাদের শিক্ষার মান সন্তোষজনক হবে না– এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো স্থান নেই। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টদের দুর্বল শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণির প্রত্যেক পাঠ শেষে এই 'নিরাময়মূলক' পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলব। এটি করা গেলে ছয় মাসের মধ্যে শিশুদের

বছরের শুরুতে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি ক্লাসের প্রথম তিন মাসকে 'নিরাময়মূলক শিক্ষা' নাম দিয়ে শিশুদের পূর্ববর্তী ক্লাসের বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের ওপর পাঠ্যবইগুলোর শেষ অংশের উচ্চমানের দক্ষতার ওপর পাঠদানের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেছিলাম। এটি করা হলে, যেসব স্কুলে করা হয়েছে, দেখা গেছে শিশুরা পূর্ববর্তী ক্লাসের পাঠ্য ওইসব বিষয়ের শেষাংশ, যা পরবর্তী শ্রেণির শুরুতে সূচনা পাঠ হিসেবে পড়ানো হয়, সেগুলো ভালোভাবে শিখে ফেলে অর্থাৎ আগের ক্লাসের থেকে যাওয়া শিখন ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেক ক্লাসের পাঠের সব দক্ষতা যদি অর্জিত হয়, তাহলে নতুন শ্রেণির শুরুতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু সফল হয়। সফল হলেই সে শিখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং আগ্রহী হলেই শ্রেণির পাঠ দক্ষতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। এতে স্কুলের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিশুর 'শিখন দুর্বলতা' বা 'ঘাটতি' পূরণ করে দিতে পারেন। ঘাটতি পূরণের জন্য পরীক্ষার কোনো অবদান নেই– সে জন্য এর দরকার দেখি না। নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও এটাই বলে যে, স্কুলের পাঠদানের নিয়মের মধ্যেই প্রথম দু'তিন মাসের শিক্ষার মান অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে– এ বিষয়ে অন্তত বিশেষজ্ঞদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

তাছাড়া শ্রেণির প্রত্যেক পাঠ শেষে ক্লাস পরীক্ষা নিতে হবে; যেমন– ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে শ্রেণি পরীক্ষাই শিশুর শিক্ষার মান মূল্যায়নে প্রধান ভূমিকা রাখে এবং দশম শ্রেণির আগে এসব স্কুলে কোনো শিশুকে কোচিং নিতে হয় না এবং কোনো শ্রেণিতে ফেল করে না কেউ। এ শ্রেণি পরীক্ষাগুলোই শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে দেয় এবং শিক্ষক সেগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে পাঠদান করেন। এক-দুই ঘণ্টার প্রান্তিক পরীক্ষা তো অনেকটা লটারির মতো হয়। এতে শিক্ষার্থীর দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত 'শিখন দুর্বলতা' ঠিকমতো প্রকাশ পায় না। ফলে কোনো প্রান্তিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানোন্নয়নে খুব একটা সহায়ক ভূমিকা রাখে না। বরং রেগুলার শ্রেণিপাঠ এতে বিঘ্নিত হয়, শিশুরা অপ্রয়োজনীয় চাপে থাকে, টিচাররা শ্রেণির পাঠদান, নিরাময়মূলক পাঠদানের চেয়ে কোচিং করাতে আগ্রহী হওয়ার একটি সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে শিক্ষকদের বেতনের বাইরে কোচিংয়ের আয়ের প্রতি লোভেরও সৃষ্টি হয়। যেমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোচিং' ক্লাস থেকে আয় উপার্জন!

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার মান বাড়াতে কিছু স্কুলকে কিছু ভালো কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে, যেখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের টার্ম শেষে অবসর সময়ে, দীর্ঘ ছুটির সময় শিশুদের স্পেশাল পাঠদান করবে, হতে পারে সপ্তাহে ৩-৪ দিন এবং সপ্তাহে দু'দিন শুধু শিক্ষকদের বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের ওপর পাঠদান করবে। এতে একদিকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিক্ষার মান বাড়বে; অপরদিকে শহর-গ্রামের, ধনী-দরিদ্রের সন্তানদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সবাই মিলে কোনো কোনো জাতীয় দিবসে গান-বাজনা, নাটক, বনভোজন, কোনো একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ বা যুদ্ধের স্থান পরিদর্শন করতে পারে, বন-বাদাড়ে ঘুরে বৃক্ষ চিনবে, ফুল, লতা-পাতা, পাখি, খাল, জলাভূমি, কৃষিপণ্য, শস্য, উৎপাদক কৃষক, শ্রমিক, গ্রামীণ নারী ও শিশুদের বৈশিষ্ট্য চিনতে পারবে। ফলে 'এরা' আর 'ওরা'– এ পার্থক্যের বোধ হ্রাস পাবে, নগর-গ্রাম ঘনিষ্ঠ হবে। আমি কয়েকজনকে ভালুকায় নিয়ে ইউনিসেফের সহায়তায় একটা 'শিশু শ্রেণির' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিলাম, যাতে একটি প্রাইমারি স্কুলকে 'মাদার স্কুল' ধরে এর পাশের পাঁচটি গ্রামে পাঁচটি শিশু শ্রেণি শুরু করেছিলাম। এখানেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ইত্যাদি শহরের বিশ্ববিদ্যালয়, বড় সরকারি কলেজগুলো হবে 'মাদার শিক্ষা কেন্দ্র' এবং প্রত্যেকটির অধীনে থাকবে ১০টি প্রাথমিক, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য বছরব্যাপী রুটিন। এমন একটি সরকারি উদ্যোগ প্রাইভেট-পাবলিক শিক্ষাকেন্দ্র মিলে বাস্তবায়ন করতে পারে। এরা প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ভাষা ও গণিতের ওপর পাঠদান করতে পারে সপ্তাহে এক বা দু'দিন।

সব শেষে বলব, কোচিং কিন্তু চলতে থাকবে। আমরা আমাদের সন্তানদের পড়াশোনা দেখেছি, অঙ্ক শিখিয়েছি, বাড়ির কাজ করতে সহায়তা করেছি, বড় ক্লাসে, কোনো স্বজন বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের টিউটর রেখে গণিত পড়িয়েছি। বর্তমানেও মা, বাবা, গৃহশিক্ষক বা বাইরে কোচিং সেন্টারে পড়তে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। এই কাজটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর 'নিরাময়মূলক' বা 'ঘাটতি পূরণে'র জন্য পড়া, যা স্কুল করে না বলে 'কোচিং' নামে গড়ে উঠেছে। 'নিরাময়মূলক শিক্ষা' ব্যবস্থার রেওয়াজ অনেক মফস্বলের ভালো স্কুলে দেখেছি। এটিকে পরিকল্পিত স্কুলভিত্তিক নিয়মানুযায়ী করা গেলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান প্রকৃত অর্থে উন্নত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু এসব স্তরে প্রচলিত ছাত্রবৃত্তির অর্থের একাংশ এ শিক্ষকরা এলাউন্স হিসেবে পেতে পারেন। তবে আবারও বলব, প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণি ও ক্লাস এইটের পরে কোনো প্রান্তিক পরীক্ষার দরকার নেই। যারা ক্লাস নাইনে পড়বে না, তারা স্ব-স্ব স্কুলপ্রধানের কাছ থেকে একটি টেস্টিমোনিয়াল বা কোনো এক ধরনের 'ক্লাস এইটের শিক্ষা সমাপ্ত' করার স্বীকৃতিপত্র পাবে। এসএসসি, এইচএসসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চ শিক্ষাস্তরে প্রবেশের পরীক্ষা–এই-ই যথেষ্ট।